মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির মুখপত্র • Mouthpiece of Murshidabad Heritage & Cultural Development Society

আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি পত্রিকার এক বছর পূর্তি ও ভাষা দিবস উপলক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। *বিষয় - "মুর্শিদাবাদ জেলার অবহেলিত ইতিহাস"।* শব্দ সংখ্যা অনধিক হাজার। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ, ২০২০
লেখা পাঠানোর জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুন - ৯৪৩৪০২১১৫৭

ত্রৈমাসিক ৪ পাতা ১ ম বর্ষ - ৫ সংখ্যা ❑ ৮ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৪২৬ সন ❑ ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ মূল্য - ৫ টাকা

বেণীপুরের রাজা বেণীমাধব

গোপাল মণ্ডল

মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত মুকুন্দবাগ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র জনপদ হল বেণীপুর। বেণীপুরের পূর্ব দিকে আজিমগঞ্জ-মাহিনগর, পশ্চিমে গড়শামা-কেঠোর-ঘুঘরিডাঙ্গা, দক্ষিণে কিরীটেশ্বরী ও উত্তর দিকে কুসুমখোলা -বড়নগর-লালিপালি অবস্থিত।

প্রায় হাজার খানেক বছর আগে এই অঞ্চলে বেণীমাধব নামে এক ক্ষুদ্র নরপতি বা রাজা বাস করতেন। তাঁর নামানুসারে পরে এ স্থলের নাম হয় বেণীপুর। তার আগে এ অঞ্চলের কী নাম ছিল তা জানা যায় না।

বেণীপুরের বিভিন্ন অংশে প্রাচীন কিছু খুব সামান্য নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেগুলো চোখে দেখলে নানা প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে।

মাহিনগর থেকে পশ্চিম দিকে ছয় সাত কিলোমিটার গেলেই বেণীপুর কেন্দ্রস্থল। রাঢ় ও সমতল ভূমির সীমাতে এই বেণীপুর। বেণীপুর ঢুকতে একটি সাঁওতাল পল্লী দেখা যায় ছায়ায় ঢাকা। পাড়াটার নাম সেকানিপাহাড়। এই পাড়ার উত্তর দিকে মাঠের মধ্যে কামারপুকুর বলে একটি পুকুর আছে। এই পুকুরের দক্ষিণ দিকে খুব পুরোনো আমলের চুন সুড়কি ও বাংলা ইটের একটি জলসিড়ি বিলুপ্ত প্রায় ও ভগ্নাদশায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জলে। স্থানীয়রা অনেকেই জানেন। হয় তো কোনো কালে এই পুকুর ঢেউ খেলাত তার জলে।

এরপর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটি বড়ো পুকুর পেরিয়ে রাস্তার ডান দিকে পুরানো আমলের কোনো মন্দির বা মসজিদ সামান্য দেওয়ালের ভগ্নাংশ চোখে পড়ে। কত বছর আগেকার কে জানে? কোনো তথ্য পাওয়া যায় না এ বিষয়ে। *(ক্রমশ)*

ইতিহাস রক্ষায় প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যাণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালার সহযোগিতায় মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধানে ও বিকৃত ইতিহাসকে নির্মূল করার লক্ষ্যে গত ২৩শে নভেম্বর, ২০১৯ প্যালেস হাজারদুয়ারি প্রাঙ্গণে এক ঐতিহাসিক

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় যাঁরা পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত, যেমন গাইড, টাঙ্গা, টুকটুক, অটো, নৌকা চালক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদে বেড়াতে আসা উৎসাহী পর্যটকরা। প্রায় চারশোর অধিক মানুষ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের উদ্দেশ্যেঃ মুর্শিদাবাদের অজানা ইতিহাস ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্নসৌধগুলো রক্ষা করার

দাবীর মাধ্যমে পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও প্রশাসনের নজরে তুলে ধরা। সেই সাথে প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধানে ও বিকৃত ইতিহাসকে নির্মূল করার

এরপর ২ পৃষ্ঠায় ▶

গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎপাত্র বিলুপ্তির পথে

মাজরুল ইসলাম

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের উত্তরাংশে মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থান। পশ্চিমে বীরভূম। উত্তরে মালদা। দক্ষিণে নদীয়া। পূর্বে অধুনা বাংলাদেশ। মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর। ভাগীরথী নদী এই জেলাকে দুভাগে ভাগ করেছে। বাগড়ি ও রাঢ় অঞ্চল। উভয় অঞ্চলেই মুসলমান ও হিন্দু পাশাপাশি বসবাস করছে।

অন্যান্য জেলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলারও মৃৎশিল্পের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। কর্ণসুবর্ণ উৎখনন এবং ফরাক্কায় ফিডার ক্যানেল কাটার সময় মাটির তৈরি নানা ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছিল।

মৃৎশিল্প এক প্রাচীন হস্তশিল্প বা কুটিরশিল্প বলে গণ্য ছিল — তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। খুব প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসেও মৃৎপাত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়। আদিম যুগের মানুষ মাটি খুঁড়ে গর্তে দ্রব্যাদি গচ্ছিত বা সংরক্ষণ করত। এই ধারনা থেকে এক শ্রেণির সমাজকর্মী (কুম্ভকার) মাটির পাত্রের সূচনা করে। হাজার হাজার বছর আগে থেকে মৃৎশিল্পের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমদিকে কুমোরেরা হাত দিয়ে জ্যাবড়া বা জোবড়া মাটির পাত্র তৈরি করত। পরবর্তীকালে চাকের সাহায্যে তারা এই কাজকর্ম করত। এখন কোথাও কোথাও বৈদ্যুতিক চাকার সাহায্যে উত্তরসূরিরা মাটির নানা

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

সম্পাদকীয়

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের দিন আমাদের মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যাণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির মুখপত্র ইতিহাসের অলিন্দের পথ চলা শুরু। এই এক বছরে আমরা জেলা এবং ক্রমশ জেলার বাইরের অবহেলিত ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছি। এখন তো ওপার বাংলার অজানা ইতিহাস নিয়েও আমরা কাজ করছি। এই সংখ্যাও গত সংখ্যায় ওপার বাংলার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে পত্রিকার মাধ্যমে। একটা বছরে হয়তো সব কিছু করে ওঠা সম্ভব হয়নি। তবুও আমরা উৎসাহ হারাইনি। চেষ্টা চালিয়ে গেছি যাতে আপনাদের সামনে অবহেলিত, অজানা ইতিহাস তুলে ধরতে পারি। আমাদের পত্রিকার আত্মপ্রকাশের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে অবহেলিত ইতিহাসের মতো আজ আমাদের মাতৃভাষাও ক্রমশ বিদেশী ভাষার চাপে অবহেলিত, কোণঠাসা। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এই বাংলা ভাষার জন্যে আন্দোলনে রফিক, জব্বার, সালাম, শফিউল, বরকত সহ কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। পরবর্তীকালে ২০১০ সালে জাতিসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। আর তাই এই মহান দিনটিকে আমরা আমাদের মুখপত্রের আত্মপ্রকাশের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত দিন হিসাবে বেছে নিই। আজ পত্রিকার একবছর পূর্তি হল। গত এক বছরে আমরা বহু পাঠকের শুভেচ্ছা পেয়েছি। আপনাদের এই শুভেচ্ছা, ভালোবাসা আমাদের আরো ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবে। আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাব আপনাদের সামনে জেলা, জেলার বাইরের অবহেলিত ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরার। আমরা জানি আপনারা ''আমাদের পাঠককুল'' আমাদের পাশে সবসময় থাকবেন।

ডক্টর বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

গত ১৪ই জানুয়ারী, ২০২০-র গভীর রাতে বহরমপুরের মনমোহিনী নার্সিংহোমে ৯৩ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন জেলার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ ডক্টর বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার ইতিহাস নিয়ে বহু গ্রন্থ (মুর্শিদাবাদ যুগে যুগে, মুর্শিদাবাদের মন্দির, শহর বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি ইত্যাদি) ও প্রবন্ধ লিখলেও, তিনি ছিলেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের বাংলার শিক্ষক ও স্কুলের সহ প্রধান শিক্ষক। বাংলার শিক্ষক থেকে ইতিহাসবিদ্ হয়ে ওঠার পিছনে ছিল শৈশব থেকে ইতিহাসের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসাই তাঁকে পরবর্তীকালে বাংলার শিক্ষক থেকে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদে্ উত্তোরণ ঘটায়। জেলার ইতিহাসের প্রতি তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে পাঠকের মনে। গত ১৪ই জানুয়ারী জেলার ইতিহাসের এক যুগের সমাপতন ঘটলো। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যাণ্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ ডক্টর বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেহী আত্মার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

গৌড়-পাণ্ডুয়ার ভ্রমণ ডায়েরী

সহেলী চক্রবর্ত্তী

(গত সংখ্যার পর)

এরপর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য তাঁতীপাড়া মসজিদ। এই মসজিদটি আনুমানিক ১৪৮০ সাল নাগাদ নির্মিত হয়। পাঁচটি খিলান যুক্ত

তাঁতীপাড়া মসজিদ

প্রবেশ দ্বার ও দশটি গম্বুজ ছিল এই মসজিদের মূল বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু আমরা যখন এর সামনে এসে দাঁড়ালাম, দেখলাম কোন গম্বুজই আর অবশিষ্ট নেই। বাংলা ইঁটের ওপর সূক্ষ্ম টেরাকোটা কাজ মুগ্ধ করল। জ্যামিতিক ও ফুলেল নক্সা মসজিদের বাহ্যিক সৌন্দর্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মসজিদের ভিতরের মিরহাবগুলো মক্কার দিক নির্দেশ করে তৈরী। মসজিদের সামনের বাগানে দুটি কালো পাথরের তৈরী নাম না জানা সমাধি। এখানে দাঁড়ানোর পর মনে হচ্ছিল সময় যেন থমকে গেছে। কিন্তু এখানে বেশীক্ষণ থাকলে তো চলবে না, গৌড়ে আরো অনেক কিছু দেখা বাকী।

তাই কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আমরা চলে এলাম মসজিদের পাশ দিয়ে সরু রাস্তা ধরে লুকোচুরি দরজার সামনে। নামের সাথে লুকোচুরি কথা

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

রানী ভবানী (১৭২২ - ১৮০২)

জিতুগোপাল চৌধুরী

স্বামী রামকান্তের মৃত্যুর পর (১৭৪৮) নাটোরের জমিদারি পরিচালনার দায় বর্তায় তাঁর বিধবা পত্নী রানী ভবানীর উপর। মুর্শিদকুলী খাঁ -এর প্রিয় পাত্র রঘুনন্দন। অপুত্রক রঘুনন্দনের জমিদারি সু-বিস্তৃত হয় তাঁর অগ্রজ রামজীবনের উপর। সুপরিচালনায় (১৭২৮) রামজীবনের দত্তক পুত্র রামকান্ত এবং দেওয়ান দয়াময় এই জমিদারিকে প্রসারিত করেন। রানী ভবানীর সময়ে (১৭৪৮) এদের জমিদারি ছিল মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোর ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ, জমিদারির অন্তর্ভুক্ত।

রানী ভবানী তাঁর পিতা ছাতিনা গ্রামের জমিদার আত্মারাম চৌধুরী। আত্মারাম দুঃস্থ্য মানুষদের, ধর্মের মানুষদের, শিক্ষা প্রসারে উদারহস্ত। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই সদগুণ প্রতিফলিত হয় শ্বশুরালয়ে। স্বামী রামকান্তের মৃত্যুর পর (১৭৪৮) ব্রহ্মচারিণী রানী তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্য সকল জীবের হিতের জন্য নিয়োগ করেন। সব থেকে উপকৃত হয়েছিল বড়নগর, নাটোর, সেরপুর। মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীর সমস্ত কাজ পরিচালিত হত বড়নগর হতে। রায়রায়ন, রঘুনন্দন এই বড় নগরের সর্বময় কর্তা ছিলেন।

দত্তক পুত্র রাম কৃষ্ণের হাতে জমিদারির ভার তুলে দেবার পর তিনি স্থায়ীভাবে বড় নগরের বসবাস শুরু করেন (১৭৮৯)। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ধামবাসী, আখরাধারী মহান্ত, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের তিনি নিয়মিত সাহার্য্য করতেন। তার অঙ্ক কম নয়। প্রায় দুই লক্ষ টাকা। সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টোল ইত্যাদিতে তাঁর দানের ক্ষেত্রে ছিল জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে, নানাদিকে প্রসারিত। মুসলমান ফকিরাও তাঁর দান কর্ম থেকে বঞ্চিত হননি। রানী ভবানী নিষ্ঠাবান হিন্দু বিধবার জীবনা চরণে অভ্যস্ত ছিলেন। দেবী সিংহেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, গোপীনাথ দেবের সেবার জন্য অনুদান দিতেন তাছাড়া অন্যান্যদের সেবার জন্য অনুদান দিতেন। যথাক্রমে - লোহাগঞ্জ সাধক বাগ, বিনোদ, বামুনীয়া, বড় নগর, মহাজন টুলী, মহিমাপুর, বরদাচারী লক্ষ্মীনারায়ন, জাফরগঞ্জ, রঘুনাথজীউ শুধুমাত্র বৈষ্ণব আখড়া নয়, সন্ন্যাসী ও ফকিররাও তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হতেন না। রাণী ভবানীকে লেখা মজনুশাহের চিঠি থেকে উল্লেখ পাওয়া যায়। দান কার্য্যের জন্য কাশীতে তিনি দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা নামে পরিচিত হন। রানীর জন্ম - ১১২৪ বঙ্গাব্দে। ৭৯ বৎসর বয়সে মৃত্যু। (১২০৩ বঙ্গাব্দে)। বড়নগরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুরুষানুক্রমে টোল শিক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ভবানী ন্যায় বাগীশ রাজশাহী থেকে ন্যায় শিক্ষক হিসাবে বড় নগরে এসে ছিলেন। রানী ভবানীর আর এক নাম ''মিতা ঠাকুর'' নামেও পরিচিত ছিলেন। ***(ক্রমশ)***

ইতিহাস রক্ষায় প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণমূলক সচেতনতা কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত সকলকে মুর্শিদাবাদের সত্য ইতিহাস পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার জন্য আবেদন জানানো হয়। বিশেষ করে গাইড, টাঙ্গা, টুকটুক, অটো ও নৌকা চালকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সত্য ও প্রকৃত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁদের প্রশিক্ষিত করে তোলা সংগঠনের লক্ষ্য বলে জানানো হয়।

সংগঠনের সম্পাদক স্বপন কুমার ভট্টাচার্য বলেন, মুর্শিদাবাদ শহরের নাম লালবাগ নয়। হবে শহর মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ নামের সাথে শহরের আবেগ জড়িত। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা আজিমুন্নেসা মানুষের কলিজা খেতেন, তাই মেয়েকে জ্যান্ত সমাধি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন মুখরোচক ভুল তথ্য পর্যটকদের কাছে আর যেন প্রচার করা না হয়। পর্যটকদের কাছে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্যেই প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীদিনে এই ধরনের প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালা সত্য ইতিহাস প্রচারের স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে করা হবে বলে সভায় উল্লেখ করেন।

এই অনুষ্ঠানে ইতিহাসের অলিন্দের চতুর্থ সংখ্যা উন্মোচিত হয়। এই সেমিনারে মুখ্য বক্তাগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গৌতম হালদার, উপ-অধিক্ষণ পুরাতত্ত্ববিদ, হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালা, গবেষক অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝাঁ; অধ্যাপক ড: সুপম মুখার্জী; ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেন্টেনারী কলেজ, শিক্ষক মহ: আলী ও মৌসুমী ব্যানার্জী, কিউরেটর, মুর্শিদাবাদ সংগ্রহ শালা।

এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বর্তমান নবাব পরিবারের বর্তমান বংশধর ও সংগঠনের সভাপতি ড: সৈয়দ মহম্মদ রেজা আলি খাঁন মহাশয়।

বন্যেশ্বর শিব মন্দির

সনাতন দাস

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গৌরবময় প্রাচীন বাংলার ইতিহাস। অথচ স্বাধীনতার আগে ও পরেও এই বিপুল ঐতিহাসিক সম্ভাবনাময় প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোই প্রয়োজন মত অনুসন্ধানের কাজ করা হয়নি। যার ফলে ইতিহাসের ধারাবাহিকায় বিচ্ছেদ ঘটেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচটি মহকুমা যথা, বহরমপুর, লালবাগ, ডোমকল, কান্দি, জঙ্গিপুর।

ভৌগোলিক ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ জেলাকে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় সমান ভাবে দ্বিখণ্ডিত করেছে। ভাগীরথীর পূর্ব দিকের অংশ বাগড়ি ও পশ্চিম অংশ রাঢ়ভূমি। রাঢ় অংশেই মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন স্থাপত্য ইতিহাস লুকিয়ে আছে। কান্দি ও জঙ্গিপুর এই দুই মহকুমায় মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় ভুমিরই অংশ।

জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি ব্লকে কমবেশী ভৌগোলিক ক্ষেত্র জুড়েই ইতিহাসের নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অথচ বহু পুরাসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে বহুকাল আগেই, আর বহু প্রত্নক্ষেত্রগুলি অবহেলায় ধুঁকছে। সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের বহু ইতিহাস আজও অজানা থেকে গেছে। আমরা মনে করি প্রত্নক্ষেত্রগুলি খননের ও প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব। গোটা তল্লাট জুড়েই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের বহু নিদর্শনের হদিসই ইতিমধ্যেই এখানে পাওয়া গেছে। যার মধ্যে কোথাও প্রস্তরমূর্তি, কোথাও বা মৃৎপাত্র, কোথাও প্রাচীন জলাভূমি, দীঘি, পুরাতন মন্দির, মসজিদ, দরগা, কোথাও প্রাচীন মুদ্রা, কোথাও আবার উঁচু ঢিবি (যেগুলো আজও খননকার্য করা হয়নি), কোথাও কোথাও মিলেছে বড় বড় পাথর, কোথাও পাওয়া গেছে পাথরের একাধিক স্তর। সেই স্থানগুলো যেমন - সাগরদীঘি সদর, শেখদীঘি, মোড়গ্রাম, দেবগ্রাম, মণিগ্রাম, চাঁদপাড়া, খেরুর, চন্দনবাটি, গয়সাবাদ, মহীপাল, বিনোদবাটি, পোপাড়া, গড়ের পাহাড় ও বন্যেশ্বর।

আমার আলোচ্য বিষয় বন্যেশ্বর শিব মন্দির .... *(ক্রমশ)*

মধ্যযুগের ইতিহাস কথা — পূর্ববঙ্গের মহাবীর ঈশা খানের স্মৃতি বিজড়িত দুর্গ নগরী স্থান ও সমাধি আজও ইতিহাসের কথা বলে

আমিনুল হক সাদী (বাংলাদেশ)

সেদিন জঙ্গলবাড়িতে এসেছিলেন কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার বাসিন্দা স্ট্যামফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইতিহাসপ্রেমী মশিউর রহমান। তাঁর ধারণা মহাবীর ঈশা খান কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতেই শায়িত আছেন। আমি সে প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, তিনি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুরের দুর্গ নগরীতেই শায়িত আছেন। কারণ মহাবীরের সমাধিটি দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। সমাধির বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। একজন মহাবীরের শেষ সমাধি কোথায় কিশোরগঞ্জের ছেলে হিসেবে এ বিষয়টি না জানাতে নিজের কাছেও দায়ী মনে হলো। তাই আজকের এ লেখাটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে মহাবীর ঈশা খানের কিছু তথ্য উপস্থাপন করলাম।

বার ভূইয়াদের অন্যতম নেতা মহাবীর ঈশা খাঁন ১৫৩৬ সালের ১৮ অক্টোবর বিবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজা কালিদাস গজদানী সিংহ নামান্তরে সোলায়মান খাঁর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। দাম্পত্য জীবনে প্রথমে স্ত্রী সৈয়দা ফাতেমা খাতুন ও দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম স্বর্ণময়ী। সন্তানদের মধ্যে মুসা খাঁ ও মোহম্মদ খাঁ। যাদের নাম আজ বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বাংলার এই মহাবীর মসনদ-ই-আলা ঈশা খান ১৫৯৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুরে মৃত্যুবরণ করেন। আজ আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা উদারমনা শক্তিমান পুরুষ। মননশীল চেতনা ইতিহাস ও নীতিজ্ঞান সত্য ও সুন্দরের মহিমায় সমৃদ্ধ ছিল তাঁর জীবন। কখনও পরা শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। তিনি আমাদের মাঝে স্মৃতিতে ভাস্কর হয়ে আছেন।

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▶

লোকনাট্য আলকাপের সার্দ্ধ শতবর্ষে সম্রাট ঝাঁকশু

কুণাল কান্তি দে

'ঝাঁকশু একদিকে আলকাপের প্রাচীন তথা মৌল ঐতিহ্যের ধারক, অপরদিকে তাঁর শিল্প ব্যক্তিত্ব নবরূপের রূপকার। কালের প্রভাবে আলকাপের ধারা যখন ক্ষীণ হয়ে আসার সম্ভাবনা দেখিয়ে ছিল তখন মুর্শিদাবাদে ঝাঁকশুই অপেক্ষাকৃত পরিশীলিত ও ক্রম বিকাশমান নাগরিক রুচির জনসমাজের কাছে আলকাপকে টিকিয়ে রাখার বাসনায় বা প্রতিযোগিতায় তাঁর সচেতন শিল্প ব্যক্তিত্ব দিয়ে, তাকে ঘষে মেজে যুগোপযোগী রূপ দিয়েছিলেন'।

লোক সংস্কৃতি গবেষক ডঃ দিলীপ ঘোষের ঝাঁকশু পরিচিতি প্রবন্ধে ঝাঁকশুর যে মূল্যায়ণ তিনি করেছেন এ পর্যন্ত অন্য কোন প্রাবন্ধিক এতখানি পরিচয় দিতে পারেননি।

আলকাপের জন্ম মূলত মালদহ জেলার রহিমপুরে হলেও এই লোকনাট্যের পীঠস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার ধনপতনগর গ্রাম; যেখানে এই শতাব্দীর জনপ্রিয় আলকাপ শিল্পী ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ঝাঁকশুর জন্ম। বাংলার ১৩০৪ সালের ১৭ই আশ্বিন। এক মধ্যবিত্ত চাঁই পরিবারে, যাদের পেশা চাষাবাদ এবং কাঁচা সব্জির ব্যবসা। তবে মালদহের এক চক্ষুহীন নাপিত বনমালী (বোনাকানা) দাসের গর্ভে আলকাপ প্রাণ পেলেও ধনঞ্জয় সরকার এই লোকনাট্যের দীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে ব্যাপৃত ও বিস্তৃত আছেন। একটানা ৬০ বছরের সাধনায় লোকসংস্কৃতির একটি দৃঢ় মাধ্যম হয়েছে আলকাপ; তাও ঝাঁকশুর নিরলস প্রচেষ্টায়। একটু একটু করে অস্থি মজ্জা ও রক্ত সঞ্চালন করে এমন একটি স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন যেখানে আলকাপ একটি ভিন্ন স্বাদের মার্জিত রুচির লোকনাট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে; যার মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারা এবং সমাজ জীবনের বিচিত্র সুস্থ মানসিকতার পরিস্ফুটন ঘটেছে; যা দেখে গ্রামের মানুষের মনে নিঃসন্দেহে সংস্কৃতির সুস্থ চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে।

এই শিল্পীর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং ভিন্ন স্বাদের গ্রামীণ সঙ্গীতের ছায়ায়, মায়ায়। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন। একবুক আশা নিয়ে পিতা বাবুরাম মণ্ডল গাঁয়ের পাঠশালায় ভর্তি করালেন মাষ্টার বানাবার স্বপ্ন দিয়ে। সেই বয়স থেকেই যাত্রা, পাঁচালী, মনসামঙ্গলের রসজ্ঞ শ্রোতা এবং সহপাঠিদের নিয়ে গলাসাধা শুরু করলেন ফাঁকা মাঠে, কখনওবা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে। কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন ঐ অপরিণত বয়সের বালক ধনঞ্জয়। ধর্মীয় কোনো আসরে সেই আকাঙ্খিত বস্তু খুঁজে না পাওয়ার বেদনা আবেগ অহরহ উন্মাদ করে তুলেছে। পড়ার প্রতি অনুরাগ সফল হল প্রাথমিক পরীক্ষা পাশের সঙ্গে সঙ্গে। উচ্চ প্রাইমারীতে ভর্তি হলেন। ক্রমশঃ সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ এবং কিশোর বয়সে গভীর রাত্রিরে অচ্ছুত আলকাপ শুনে তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। সমসাময়িককালে প্রকৃত লোকশিক্ষার কোনো মাধ্যম দৃঢ়ভাবে দানা বাঁধতে পারেনি, যার দ্বারা গ্রামীণ মানুষ কিছুটা সভ্য মানুষের কাছে অচ্ছুত আলকাপকে এমন রূপ দেওয়ার স্বপ্ন গড়লেন, যার দ্বারা এই শিল্পকে মার্জিত এবং সংস্কার করে সুস্থ আমোদের উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অনুভূতি, সমাজ সমস্যা, ধর্ম সাম্প্রদায়িক প্রীতি ফুটে ওঠে; এবং গ্রামীণ মানুষ সাংস্কৃতির উত্তাপে কিছুটা উষ্ণ এবং চাঙ্গা হয়। *(ক্রমশ)*

কালগত বিবর্তনের পথে শহর খাগড়া

হরিশঙ্কর দত্ত

(গত সংখ্যার পর)

সেকালে বড় মনোহারীর দোকান বলতে ছিল বিনায়ক সেনের ইষ্টার্ণ সিণ্ডিকেট, কমলচন্দ্রের কমলাগায় ও পটল সেনগের সেন অ্যাণ্ড কাজিন্স। ঘোষ কোম্পানির দোদান স্বাধীনতা পরবর্তীকালের। পুরনো জুতোর দোকান বলতে ছিল চৌরাস্তায় বেঙ্গল সু ষ্টোর ও উকিল যতীন বড়ালের বড়াল সু ষ্টোর। মুসলমানদের জুতোর দোকান অনেকগুলি ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর সেগুলি উঠে যায়।

সেকালের ডাক্তারখানা বলতে ছিল ভিক্টোরিয়া ফার্মেসী, দেশবন্ধু ফার্মেসী, অন্নপূর্ণা ফার্মেসী, ষ্টার মেডিক্যাল হল, পুত্তর ফার্মেসী ও পপুলার ফার্মেসী। নগেন্দ্র ফার্মেসী ও সেন ক্লিনিক পরবর্তীকালে খোলা হয়।

খাগড়ার প্রাচীন বই -এর দোকান বলতে ছিল ভুজঙ্গ ভূষণ কুণ্ডু এণ্ড সন্সও বেঙ্গল পেপার ট্রেডিং কোং। বিমলা ষ্টোর পরবর্তীকালের। স্বাধীনতা লাভের পর ষ্টুডেন্ট বুক ডিপো ও মডার্ণ বুক সিণ্ডিকেট আত্মপ্রকাশ করে। ষ্টুডেন্ট বুক ডিপো বন্ধ হলে ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরী খোলা হয়। কিন্তু সেটাও এখন বন্ধ হওয়ার পথে।

খাগড়ার প্রাচীন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ছিলেন নরহরি সাহা, হরিপদ সাহা ও পটল ওস্তাদ। খাগড়ার ছানা বড়ার একদিন ভারত জোড়া খ্যাতি ছিল। তার প্রবাদ প্রতিম কারিগর ছিলেন পটল ওস্তাদ। পাঁচসের, দশসের এমনকি এক মণ ওজনের ছানাবড়া তৈরীর কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন পটল ওস্তাদ। তাঁর তৈরী একমণী ছাড়াবনা সেকালের বানজেটিয়ায় অনুষ্ঠিত শিল্প মেলায় প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হ'ত। 'খাবার', 'জলযোগ', দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার', প্রিয় জলযোগালয়, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দোকানগুলি পরবর্তীকালের।

এখন খাগড়া বড়মুড়ির ধার বলতে যে জায়গাটা বোঝায় সেখানে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও জল নিকাশি খাল ছিল। বর্ষাকালে ভাগীরথীর জল বেড়ে গেলে সেই বাড়তি জল ঐ মুড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে বিষ্ণুপুর বিলে ফেলা হ'ত। নেতাজী রোড ও মণীন্দ্র রোডের তলা দিয়ে ঐ জল পাশ করানো হ'ত। এই মুড়ির উপরেই একসময় জগন্নাথ মজুমদারের জে.এন. একাডেমি স্কুল ছিল। তারই পাশে একটি উঁচু চাতালে প্যাঁচযন্ত্র বসানো ছিল। *(শেষ)*

▶ ৩ পৃষ্ঠার পর

পূর্ববঙ্গের মহাবীর ঈশা খানের স্মৃতি বিজড়িত দুর্গ নগরী স্থান ও সমাধি আজও ইতিহাসের কথা বলে

মোঘল বিদ্রোহী বঙ্গবীর মসনদ-ই-আলা ঈশা খা'র স্মৃতি বিজড়িত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থাপনা ও নিদর্শনগুলো কালের গর্বে হারিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ঈশা খা'র জঙ্গলবাড়ী, সোনারগাঁয়ের রাজধানী, একডালা, কত্রাবো, কদমরসুল, এসারসিন্ধুর ও খিজিরপুর দুর্গ। অযত্ন অবহেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে শায়িত রয়েছেন গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুরের মসনদ-ই-আলা ঈশা খা। তার কবরটিও রয়েছে অজপাড়া গায়ের নীরব স্থানে খুবই জরাজীর্ণ অবস্থায়। শুধু তাই নয় তাঁর ছেলে বাংলার শাসক (১৫৯৯-১৬১২) মুসা খাঁ'র মাজারটিও ঢাকার কার্জন হলের পার্শ্বে পরিত্যাক্ত অবস্থায় রয়েছে। সুবে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওয়োর অধিপতি বার ভুইয়াদের অন্যতম নেতা মহাবীর ঈশা খাঁ বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিবীদ হলেও বর্তমান রাজনীতিবীদসহ সংশ্লিষ্টদের এ ব্যাপারে কারও কোনো মাথা ব্যাথা নেই। ঈশা খাঁ'র ইতিহাস ঐতিহ্য ও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো সংরক্ষণের নেই কোনো উদ্যোগ। ফলে আগামী প্রজন্ম তাঁর বীরত্বগাঁথা ইতিহাস সম্পর্কে জানার বাহিরে থেকে যাচ্ছে। *(ক্রমশ)*

লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। এজন্য মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি কোনো ভাবে দায়ী নয়।

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎপাত্র বিলুপ্তির পথে
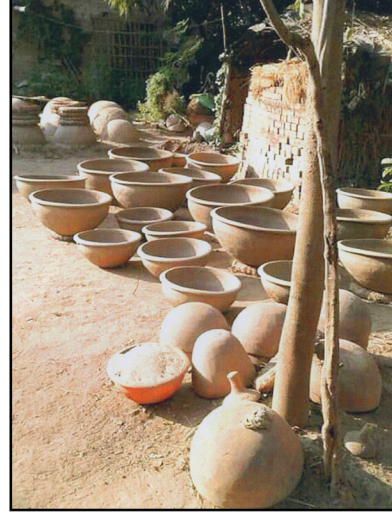
ধরনের মাটির পাত্র তৈরি করে। জেলার দুটো অঞ্চল — রাঢ় ও বাগড়িতেই কুম্ভকার, পাল ও রুদ্রপাল সম্প্রদায়ের খোঁজ পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায় মূলত মৃৎশিল্পের সঙ্গে সংপৃক্ত। জেলায় মৃৎশিল্পের সেই প্রাচীন ধারাটি এখনো কোথাও কোথাও দেখা যায়। তবে, জেলার মৃৎশিল্পীদের দুটি পৃথক ধারায় ভাগ করা যেতে পারে। একদল মাটির বাসনপত্র, আরেক দল প্রতিমা তৈরি করে। দুই ধারার সঙ্গেই যুক্ত মৃৎশিল্পীরা সকলেই কুম্ভকার সম্প্রদায় ভুক্ত।

মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ী ও রাঢ় অঞ্চলে দোঁয়াশ এবং এঁটেল মাটি দেখা যায়। মাটির তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহার্য বাসনপত্র প্রস্তুত ও বিক্রয়ের মাধ্যমে তারা জীবন ধারন করে থাকে। জেলার তেঁতুলিয়া, ভগবানগোলা, দৌলতাবাদ, সাটুই, কাঁঠালিয়া, দোহালিয়া, বোনতুলি ও বালিরঘাট প্রভৃতি গ্রামগুলিতে এখনও এই শিল্পের দেখা পাওয়া যায়। জেলায় যে সব লোকশিল্প পূর্বে ছিল তার অনেকটাই অবলুপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে যেগুলো এখনও টিকে রয়েছে সেগুলো হল — কাঠের কাজ, মেলার কাজ, বাঁশের কাজ, কাঁসা-পেতলের কাজ, রেশমের কাপড়, তাল খেজুরের পাটি, কাঁথা ও মাটির মৃৎপাত্র। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিমা গড়েও থাকে। তবে ধুঁকে ধুঁকে হলেও এরা বংশ পরম্পরায় এই শিল্পের ধারাটি বাঁচিয়ে রেখেছে। *(ক্রমশ)*

▶ ২ পৃষ্ঠার পর

গৌড়-পাণ্ডুয়ার ভ্রমণ ডায়েরী

লুকোচুরি দরজা

যুক্ত হওয়ায় এই দরজার প্রতি আগ্রহ বাড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আদতে এটি বাংলার সুবেদার শাহসুজা, সতেরো শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে নির্মাণ করেছিলেন, যা পুরোটাই মুঘল রীতিতে তৈরী। প্রবেশ পথ তৈরীতে ইঁটের ব্যবহার করা হয়েছে। আকারে এটি আয়তাকার। দক্ষিণ দিকে গুমটি ফটক যা সুলতানী আমলে নির্মিত, তা থাকা সত্ত্বেও মুঘল সুবেদার শাহ সুজা তাঁর প্রবেশ পথ হিসাবে তা ব্যবহার না করে এই ফটকটি তৈরী করেন। ফটকের নাম বাচ্চাদের লুকোচুরি খেলা থেকেই এসেছে, সম্ভবত যা অনেক পরে এসেছিল। লুকোচুরি দরজার কাছে এসে আমরা মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যাণ্ড কালচারাল ডেভলমেন্টের সদস্যরা চারিদিকে ছড়িয়ে গেলাম। *(ক্রমশ)*

লোকসংস্কৃতি গবেষক পুলকেন্দু সিংহ স্মরণে

লোকায়ত জীবন এবং লোকশিল্প যাঁর ছোঁয়ায় জীবন পেয়েছিল, গত ২৩শে জানুয়ারী, ২০২০ তিনি অমরলোকে যাত্রা করেন। গ্রাম সেবকের সরকারী কাজের সূত্রে দরিদ্র লোকশিল্পীদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। আর তাই তাঁর কলমে বার বার উঠে আসে। তাঁদের কথা তাঁর লেখা কিছু বই হল মুর্শিদাবাদ লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য, মহাজীবনের কবিতা, লোকায়ত মুর্শিদাবাদ, স্থান-কাল-পাত্র, পঞ্চায়েত ও লোকসংস্কৃতি, ফিরে চল মাটির গানে, মুর্শিদাবাদের লোকশিল্পী, মুর্শিদাবাদে সুভাষচন্দ্র, মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি। ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীত দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমি তাঁকে আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন পুরস্কার দেয়। ২০১০ -এ বাংলা একাডেমি থেকে পান তাপসী বসু স্মৃতি পুরস্কার। আমরা মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে জেলার লোক সংস্কৃতির যুগপুরুষকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য (৯৪৩৪০২১১৫৭), মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক - ফারুক আব্দুল্লাহ (৯৪৩৪৬৪৪০৮৯), সহ-সম্পাদিকা - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), সম্পাদকমণ্ডলী - অপূর্ব কুমার সেন, অর্ণব রায়।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্তী। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮)। মুদ্রণে - মেসার্স কিস্ অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ